Charlands at the Border: Livelihoods, Opportunities, and Crisis

সীমান্তে চরঃ জীবিকা, সুযোগ এবং সঙ্কট

Research Review Journal of Interdisciplinary Studies
double-blind peer-reviewed and refereed online quarterly Journal
ISSN (online): 3108-0472
1(3) 1-15, 2025
©The Author(s) 2025
10.31305/rrjis.2025.v1.n3.001
https://rrjournals.in/

Received: 13 Oct, 2025
Revised: 29 Oct, 2025
Accepted: 11 Nov, 2025
Published: 31 Dec, 2025

*Chaitanya Majumdar

Assistant Professor, Department of Political Science, Nabagram Hiralal Paul College, Konnagar, Hooghly 712246, W.B. & PhD Scholar, Centre for Studies in Social sciences, Calcutta. Kol-700094.

Abstract: *This chapter analyzes the everyday lives, livelihoods, and interactions with state governance of people living in the charlands along the India–Bangladesh border. The char is examined not merely as a geographical terrain but as a dynamic social and political space shaped by river erosion, migration, uncertainty of citizenship, and the complexities of border governance. Through historical processes of border formation, colonial land laws, shifting river courses, and the continual emergence and submergence of chars, this region has become an ambiguous zone of state sovereignty. Based on fieldwork, the chapter shows how char dwellers have gradually shifted from agriculture to border-based commodity movement and informal economic activities, and how they have developed survival strategies through negotiations with security forces, local administration, and political networks. The chapter argues that at the char border, the boundary is not just a line but a political process reproduced in everyday life, where questions of citizenship, legality, power, and livelihood are deeply intertwined.*

Keywords: *Charland; India–Bangladesh char border; river erosion; shifting land; migration; citizenship and legality; state and sovereignty; livelihood strategies*

Abstract in Bengali: *এই অধ্যায়টি ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন চরভূমিতে বসবাসকারী মানুষের জীবন, জীবিকা ও রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তাদের প্রতিদিনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। চরকে এখানে কেবল ভৌগলিক ভূখণ্ড হিসেবে নয়, বরং একটি পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসর হিসেবে দেখা হয়েছে, যেখানে নদীভাঙন, অভিবাসন, নাগরিকত্বের অনিশ্চয়তা এবং সীমান্ত শাসনের জটিলতা একত্রে কাজ করে। ঐতিহাসিক সীমান্ত নির্মাণ, ঔপনিবেশিক ভূমি আইন, নদীপথের পরিবর্তন এবং চর জেগে ওঠা ও বিলীনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের এক অস্পষ্ট ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে চরবাসীরা কৃষিকাজ থেকে ধীরে ধীরে সীমান্তভিত্তিক*

*Corresponding Author
Chaitanya Majumdar, Assistant Professor, Department of Political Science, Nabagram Hiralal Paul College, Konnagar, Hooghly 712246, W.B. & PhD Scholar, Centre for Studies in Social sciences, Calcutta. Kol-700094
chaitan.majumdar92@gmail.com

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-Commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed.

Scan and Access

পণ্য পারাপার ও অসংগঠিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকেছেন এবং কীভাবে নিরাপত্তা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে তারা টিকে থাকার কৌশল গড়ে তুলেছেন। এই অধ্যায় যুক্তি দেয় যে, চর সীমান্তে সীমান্ত কেবল একটি রেখা নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনের ভেতরে পুনঃউৎপাদিত এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যেখানে নাগরিকত্ব, বৈধতা, ক্ষমতা ও জীবিকার প্রশ্ন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

Keywords: *চরভূমি (Charland), ভারত–বাংলাদেশ চরসীমান্তে নদীভাঙন, পরিবর্তনশীল ভূমি, অভিবাসন, নাগরিকত্ব ও বৈধতা, রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব, জীবিকার কৌশল।*

1 | ভূমিকা

সীমান্তকে সাধারণত দেখা হয় রাষ্ট্রের প্রান্তিক রেখা হিসাবে, যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার নির্ধারিত সীমানা শেষ হয় এবং পরবর্তী সীমারেখা থেকে শুরু হয়। সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সীমান্তকে শুধু ভৌগলিক রেখা নয়, বরং একটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি রূপে দেখার প্রস্তাব করা হয়েছে। ধারণাটি তুলে ধরে যে, সীমান্ত নিজেই একটি সক্রিয় উৎপাদনশীল ক্ষেত্র-যেখানে রাষ্ট্র, জাতি, পরিচয় ও ক্ষমতার জটিল বিন্যাস গঠিত ও পুনর্গঠিত হয়।[1] সীমান্তের আলোচনায় নানা ধরণের ব্যাখা বিভিন্ন লেখকের থেকে পাওয়া গেছে, তবে চর সীমান্তের নানান দৃষ্টিভঙ্গি আমার এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে। সীমান্তের জীবীকার সাথে জুড়ে থাকা বিভিন্ন রকমের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু মানুষের জীবীকার নানাবিধ উপায়। তাদের জীবন যাপনের সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তার ঝুঁকি, আবার অনেক সময় বিপন্ন মানবাধিকারের বিষয়টিও দৈনন্দিন টানাপোড়েনের সর্বময় সঙ্গী। রাষ্ট্রের সন্দেহ সতত, তাই মানুষ সীমান্তে বসবাস করে বলে দৈনন্দিন জীবনের সাথে নাগরিকতার প্রশ্নটি জুড়ে আছে। নিরাপত্তার বেষ্টনী, প্রতিনিয়ত নজরদারির আওতাধীনে থাকাই জনজীবনের নিত্য নৈমিত্তিক অনুষঙ্গ। তবুও মানুষের বসবাসের সাথে খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা মেটাতে এই অনিশ্চয়তা এড়িয়ে গিয়ে দূরে কোথাও মূল ভূমিতে বসবাস করেনা। অনেকে আবার এই ঝুঁকি এড়িয়ে অন্যত্র বসবাস করে বা বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নেতিবাচক প্রভাবে অথবা প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে; সহায় সম্বলহীন হয়ে বাস্তুত্যাগের মাধ্যমে অন্য জেলা বা রাজ্যে পাড়ি দেয়। তাদের সহায় সম্বলহীনতা সীমান্ত কেন্দ্রিক জীবনের ঝুঁকিকে রাষ্ট্র মান্যতা দেয়না। অন্যদিকে নিরাপত্তাহীন জীবনের উদ্বেগ বরাবরই তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে দেয়। ঠিক তেমনি ভাসমান জীবনের প্রাত্যহিকী চর সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে ওঠে। তারা প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করে বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে, বেঁচে থাকে রাষ্ট্র যন্ত্রের সন্দেহের চোখে। বারবার প্রমানপত্র দিয়ে নাগরিকতা এবং বে-নাগরিক হওয়ার দোলাচল নিত্যদিনের সঙ্গী।[2] তবে এই না-নাগরিক হওয়ার নাভিঃশ্বাস সীমান্ত কেন্দ্রিক বসবাসকারী মানুষের দৈনন্দিনের চলমান ঘটনা।[3] এরকমই এক উদাহরণ চর সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের জীবন চিত্রে ঘটে যাওয়া নিত্য দিনের প্রতিপাদ্য। তাই অনিশ্চিত জীবনের নানা ব্যাখা আছে সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিষয় এবং সামাজিক স্তরের মধ্যে। কিন্তু চর জীবনের অনিশ্চয়তা মানুষকে একটু বেশি প্রভাবিত করে। এখানে বাস্তু জমি থেকে কৃষি জমি সব কিছু প্রকৃতির মর্জির কাছে মাথা নত করে। বাংলাদেশের চর নিয়ে আব্দুল বাকির 'ল্যান্ড অফ আল্লা জানে' বইটিতে আলোচনা আছে- অর্থাৎ চর আসলে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ভূমি। সেই চর সীমান্ত যদি সীমান্ত লাগোয়া হয় তবে তার বাস্তবতা ফুটে উঠবে অনিশ্চয়তার প্রতিটি পরতে। বর্ডার লাগোয়া এই এলাকা গুলোর অবস্থান, নির্মাণ, বসবাসকারী মানুষ সব কিছু নানা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। এই এলাকায় সামাজিক অবস্থান, নির্মাণ জটিল চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবাহিত হয়। ব্যাখ্যা করলে চর কেন্দ্রিক আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আমি এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

[1] Space and Territoriality: Borderscapes and Borderlanders of the Chars, Bikash Sarma, International Studies 50(1&2), Jawaharlal Nehru University, Sage Publications,92–108, 2016.

[2] নাগরিকতা প্রমাণপত্র সব সময় আবশ্যক হয়ে পড়ে। অনেক সময় সীমান্ত এলাকার মধ্যে বাহিনীদের দ্বারা সার্চ চলে। ঐ সময় প্রমাণপত্র রাখা তাদের কাছে একমাত্র পরিচয় হয়ে ওঠে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সঠিক নাগরিকতার প্রমাণপত্র না দেখাতে পারলে তাদের ওপর সীমান্ত রক্ষীদের দ্বারা অত্যাচারের স্বীকার হয়। ক্ষেত্র-সমীক্ষা এলাকা থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় এই ধরণের কথা শোনা যায়।

[3] যেহেতু চরের ক্ষেত্রে সীমানা নির্ধারণের মাপকাঠি কাঁটাতারের উপস্থিতি নেই তাই বসবাসকারী মানুষের ওপর সন্দেহ এবং পরিচিতি বার বার প্রমাণ করাতে হয়। মুশকিল হয় যখন বাহিনীদের এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানির বাহিনীর পরিবর্তন হয়।

ভারত-বাংলাদেশে বেশ কিছু সীমান্ত বরাবর বয়ে যাওয়া নদীতে অবস্থিত চরগুলো এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আবশ্যক। চর মূলত ভূমি ও জলের মধ্যবর্তী এক পরিবর্তনশীল বাস্তবতা, যেখানে ভূমি কখনো গড়ে ওঠে, আবার কখনো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ভৌগলিক অবস্থান রাষ্ট্রের জন্য সীমান্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল করে তোলে। ফলে, এই এলাকাগুলতে বসবাসকারী মানুষদের নাগরিকত্ব, বাসস্থান এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রায়শয়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়।[4] এই প্রসঙ্গের বিস্তার এবং চর কেন্দ্রিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। তাই চর সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের জীবিকা এবং জীবনযাত্রাকে বিশ্লেষণের পূর্বে আমি চরের নির্মাণ ও গঠন প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। একই সাথে চরে বসবাস সংক্রান্ত আইনি বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা করে বোঝার চেষ্টা করবো কিভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থাপনা চরের ক্ষেত্রে কার্যকারী হয়। তাছাড়া আমার গবেষণাপত্রের মূল বিষয়বস্তু ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তের নিকটে অবস্থানকারী এলাকার মানুষের জীবন জীবীকার সঙ্গে জুড়ে থাকা অনিশ্চয়তা ও ভিন্নতা বিশ্লেষণ করা। ফলে মানুষের যাপনের সাথে যুক্ত নানাবিধ বিষয়াবলী আলোচনা করতে গিয়ে আমার এই অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সীমানায় অবস্থিত চর নিয়ে আলোচনা করবো। অনেক লেখার ব্যাখ্যায় দেখা যায় চরের নিজস্ব আইডেন্টিটি আছে। তবে সীমান্তের কাছে থাকার কারণে দুই দেশের কাছে চরের কৌশলগত অবস্থান প্রতিনিয়ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[5] মূল ভূমি অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পলি জমে তৈরি হওয়া চরের অবস্থানের গুরুত্ব থাকলেও সীমান্তের কাছে থাকা চরভুমির অবস্থান গুরুত্ব এবং অস্তিত্বের পার্থক্য ভিন্ন। সাথে আন্তর্জাতিক সীমানার স্থান বিশেষে সীমান্তের অস্তিত্বের(আইডেন্টিটি) পার্থক্য পরিলক্ষন করা যায়।[6] অনেকেই এই বিষয় বিস্তর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে চরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখায় আলোচনা করা হয়েছে চরের নির্মাণ প্রসঙ্গে, আবার চরের মানুষের জীবিকা নির্বাহের দিকটিও আলোচনায় এসেছে। বিভিন্ন লেখক ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন স্থান এবং অবস্থান পরিবর্তনের সাথে চরের নিজস্বতা স্পষ্ট হয়েছে। এই অস্তিত্ব ব্যাখায় চরের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা জরুরী।

2 | চরের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা

বিভিন্ন নিবন্ধ থেকে এটাই বোঝা গেছে যে চর হল নদীর নিম্নাঞ্চলে পলি জমে তৈরি হওয়া দ্বীপের মতো ভূমি।[7] এগুলি প্রধানত বালি ও পলি দ্বারা গঠিত, তাছাড়া নদী তীরের ভূমি ক্ষয় থেকে তৈরি হওয়া পলি জমে চরের উদ্ভব হয়। যখন নদীর জলে পলির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নদীর বহন ক্ষমতা কমে আসে, তখন পলি ধীরে ধীরে নদীর তলদেশে জমা হয়ে নতুন চর তৈরি করে। এরকমই উদাহরণ হল- গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র- যার তলদেশে পলি জমে তৈরি চর বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল জুড়ে, ছোট ছোট নদীগুলি প্রধান বদ্বীপ অঞ্চলে পৌঁছানোর আগে, পলি জমে চর তৈরি করে। নদীর চর বরাবরই একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যা পলির জমা এবং ক্ষয় প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলমানতা বজায় থাকে। চরের নীচে কোনো শক্ত পাথরের স্তর না থাকায় বালি ও পলি দিয়ে গঠিত চর বন্যার সময়ে ক্ষয়প্রবণ সহজ হয়। ক্ষয় ধীরে এবং দ্রুত দুই রকম ভাবে হতে পারে। ফলে হঠাৎ-ই বিশাল অংশের ভূমি নদীতে মিলিয়ে যেতে পারে। এই কারণগুলির জন্য একটি চর কত বছর টিকে থাকবে তা বলা অনিশ্চিত। চর এবং নদী তীরের ক্ষয় সাধারণত বর্ষাকালে ঘটে, তবে গ্রীষ্মের শুষ্ক আবহাওয়াতেও নদীর জলের স্তর দ্রুত নেমে গেলে নদী তীরের ক্ষয় হতে পারে।[8]

3 | চরের গঠন ও প্রকৃতি

চর বা চরভূমির পরিচিতি নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করা এখানে জরুরী হয়ে পড়বে। বাংলা শব্দ চর বা চরভুমি দ্বারা নদীর তলদেশে থেকে উঠে আসা এক ধরণের ভাসমান ভূমিকে বোঝানো হয়। চরকে শুধুমাত্র ভূমি ও জলের মিশ্রণ হিসাবে নয় বরং এক ধরণের পরিবর্তনশীল পরিবেশ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ভূমি ও জলের কোন স্থায়ী বিভাজন নেই। চর একধরণের প্রাকৃতিক গঠন, যা সময়ের সঙ্গে নদীর স্রোত ও প্রবাহের কারণে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির জন্য চর কখনো ভূমি, কখনো জল, আবার কখনো এই দুটির সংমিশ্রণে (পুরো ভূমিও না আবার পুরো জলও নয় এমন অবস্থা) গঠিত হয়, কিন্তু তা পরিবর্তনশীল। এই রকম রুপান্তরধর্মী চরের ব্যখ্যা দিতে গিয়ে কুন্তলা লাহিড়ী

[4] Space and Territoriality: Borderscapes and Borderlanders of the Chars, Bikash Sarma, International Studies 50(1&2) Jawaharlal Nehru University, SAGE Publications pp. 92–108 2016.
[5] The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52, pp. 103.
[6] ICRIER Policy Series, Trans-Border Identities, Sukanta Behera, No. 1, May 2011.
[7] Fleeting Land, Fleeting People: Bangladeshi Women in a Charland Environment in Lower Bengal, India, Kuntala Lahiri-Dutt, Gopa Samant, Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 13, No. 4, Sage Publication, 2004.
[8] তদেব।

দত্ত এবং গোপা সামন্ত চরকে 'হাইব্রিড' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[9] চর ভুমিগুলি একাধারে ভূমি, আবার একটি শুধুমাত্র ভৌগলিক বা প্রাকৃতিক বৈচিত্রের নিদর্শন নয়, বরং এটি মানুষের বসবাস, জীবিকা, সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেও একটি পরিবর্তনশীল বাস্তবতা সৃষ্টি করে। এই চরগুলোর জন্ম ও ক্ষয় নির্ভর করে নদীর জলপ্রবাহ ও পলি সঞ্চয়ের ওপর, যা বছরের পর বছর চলতে থাকে। কিছু চরের গঠন ও ক্ষয় কয়েক মাসের মধ্যে ঘটে যায় আবার কিছু চর বহুবছর টিকে থাকে, এক সময় স্থায়ী ভূখণ্ডে পরিণত হয়। বৃহত্তর গঙ্গা- ব্রহ্মপুত্র- মেঘনা নদীর দ্বারা বয়ে আনা পলি জমার ফলে অববাহিকায় চরগুলো সৃষ্টি হয়। হিমালয় থেকে নামা জলাধারগুলো বিশাল পরিমাণ পলি বয়ে আনে, যা সমতলে এসে জমা হয় এবং নতুন চর তৈরি করে। এসব চর ধীরে ধীরে ঘাস, লতা পাতা ও অন্যান্য গাছ পালায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, যা চরের মাটিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। চরগুলর অবস্থান মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন, ফলে সেগুলো প্রশাসনিক ও সামাজিক রূপে মূলভূমির অংশ হলেও প্রায়শই সরকারী নীতির আওতার বাইরে থেকে যায়। স্থানীয় মানুষের কাছে চর হল একদিকে সুযোগ, আবার অন্যদিকে এটি একটি বাস্তবতা যা আজ আছে কাল নেই।[10]

4 | চরের ধারণা এবং অধিকারের দাবী

জন লকের ধারনায় 'wasteland' বা অনাবাদি জমিকে কোন মালিকানাহীন জমি হিসাবে ধরা হত। পরে অবশ্য চাষাবাদ বা শ্রমের মাধ্যমে যে কেউ নিজের করে নিতে পারতো। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই ধারণার মাধ্যমে চর ভূমিকে অনাবাদি ও পরিতক্ত্য বলে ধরে সেটির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেছিল। যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে চরের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে জন লকের অনাবাদী ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে থাকে। তবে চরভুমির উপর বিভিন্ন দাবী ও পাল্টা দাবীকে প্রভাবিত করার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ভিত্তি হল 'অ্যালুভিয়ান ও ডিলুভিয়ানের আইন' যা রোমান আইন থেকে গ্রহণ করা হয়।[11] এই আইন থেকে- ভূমি সংস্কার নীতির মতো ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতে ভূমি আইনে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।[12] এই সংক্রান্ত নিয়ম কানুন নির্ধারণের অন্যতম একটি আইন ছিল চরের অধিকারের আইন। চরের জমির উপর অধিকারের দাবী এবং চরের জমির মালিকানা ভিত্তিক ধারণাটি আরও স্পষ্ট হল উপনিবেশিক আইনের ধারণা যখন কার্যকর করা হল।[13] এই আইনে বলা হয়েছিল, যদি চর এবং তীরের মধ্যবর্তী নদীর জল অগভীর ও চলাচলের যোগ্য হয়, তবে চরটি নিকটবর্তী জমিদারের অধীনে থাকবে। এই আইনের মতে, যদি কোন দ্বীপ নদীর মাঝখানে গঠিত হয়, তবে তা নদীর উভয় তীরের জমির মালিকদের যৌথ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি দ্বীপটি নদীর মাঝ বরাবর না হয়ে একটি তীরের কাছাকাছি হয়, তবে সেটি ওই তীরের মালিকের মালিকানাধীন হবে।[14] সাগরে গঠিত দ্বীপগুলোর ক্ষেত্রে যেখানে মালিকানা নির্ধারিত হতো 'প্রথম দখলকারী'র অধিকারের ভিত্তিতে, নদীতে গঠিত চর বা দ্বীপগুলোর ক্ষেত্রে মালিকানা নির্ধারিত হতো 'নিকটবর্তী তীরভূমি'র ভিত্তিতে। অর্থাৎ চরটি কোন তীরের কাছাকাছি, তা-ই নির্ধারণ করত তার মালিকানা। The Bengal Alluvion and Diluvion Regulation (1825) হলো চরের বিষয়ক প্রাচীনতম আইনগত রেফারেন্স, যা এই ধরনের সংজ্ঞা ও বিধান নির্ধারণ করেছিল। এই আইন অনুযায়ী, যদি চর এবং তীরের মধ্যবর্তী জলাধার এতটাই গভীর বা বিস্তৃত হয় যে তা পারাপার যোগ্য নয় তবে সেই চর সরকারি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। তবে যদি জলাধারটি অগভীর বা পাড়ি দেওয়ার উপযোগী হয়, তাহলে চরটি নিকটবর্তী তীরের মালিকের অধিকারে থাকবে।[15] এই আইন তৎকালীন বাংলার পরিবর্তনশীল চরের জমির মালিকানা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কারণ, নদীর প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন নতুন চর জাগে, তেমনি অনেক জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নদীর সংলগ্নতার নীতির ভিত্তিতে মালিকানা নির্ধারণের কারণে জমিদার, সরকার ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত। যদিও পরবর্তী সময়ে আইন ও স্থানীয় প্রথা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে ১৮২৫ সালের এই আইন দীর্ঘদিন জমি অধিকারের দাবির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

[9] Dancing with the River People and Life on the Chars of South Asia, Kuntala Lahiri-Dutt and Gopa Samanta, Yale University Press New Haven & London,2013.
[10] Dancing with the River People and Life on the Chars of South Asia, Kuntala Lahiri-Dutt and Gopa Samanta, Yale University Press New Haven & London,2013.
[11] Lands and communities in flux: the chars in the Ganga-Brahmaputra deltaic region, Debdatta Chowdhury, Presses universitaires de la méditerranée, November,2020.
[12] Roots and Ramifications of a Colonial 'Construct': The Wastelands in Assam Gorky Chakraborty, IDSK, September, 2012.
[13] Lands and communities in flux: the chars in the Ganga-Brahmaputra deltaic region, Debdatta Chowdhury, Presses universitaires de la méditerranée, November,2020.
[14] The Alluvion and Diluvion regulations, 1825 Bengal Regulation xi of 1825(26th May, 1825).
[15] তদেব

এই বিধানের কাঠামোতে চর (নদীর দ্বীপ) সংক্রান্ত মালিকানা নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে চরের সংলগ্নতা (এখানে কে বেশি দাবিদার সে বিষয়ে বলা হয়েছে) এবং রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে মালিকানা নির্ধারণ করে। আইনটি যেখানে কঠোরভাবে প্রযোজ্য নয়, সেখানে 'ন্যায়বিচার, সমতা, প্রথা ও সুস্থ মতামতের' ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধানও রাখা হয়েছে। তবুও বহু ক্ষেত্রে জমি জটিলতা বলা ভালো বিরোধের প্রমাণ লক্ষ্য করা গেছে। পুনরুদ্ধার-স্থানেই বা পুনর্গঠন হলো সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলোর একটি, যেখানে একটি চর বিলীন হওয়ার পর আবার নতুন করে জেগে ওঠে। আইন অনুযায়ী, যদি আগের মালিক বিলীন হওয়া অংশের জন্য সরকারকে কর দিয়ে যান, তবে পুনরায় জেগে ওঠা চরের কর প্রদানকারী ব্যাক্তির মালিকানায় থাকবে। তবে যদি তিনি রাজস্ব প্রদান বন্ধ করেন, তাহলে তিনি পুনরায় জেগে ওঠা চর বা তার অংশের ওপর অধিকার হারাবেন। চরের মালিকানা দাবির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে—নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার পর ২০ বছর বা পুনর্জাগরণের পর কমপক্ষে ৩ বছর রাজস্ব প্রদানের কথাও ঔপনিবেশিক আইনে বলা হয়েছে। সাধারানত এই আইন মূল একালায় বইয়ে যাওয়া নদী থেকে জেগে ওঠা চরের বিধি নির্ধারণ করা আছে। তবে সীমান্তবর্তী চরের ক্ষেত্রে এধরনের আইনের বাস্তবায়ন আরও জটিল হয়ে ওঠে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত নদীর পথ পরিবর্তনের ফলে যদি কোন চর এক দেশে বিলীন হয়ে অন্য দেশে পুনরায় জেগে ওঠে, তাহলে তা আন্তর্জাতিক বিরোধের কারণ হতে পারে।[16] সীমান্তে চরের মালিকানা নিয়ে বিরোধ তাছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত জটিলতা দেখা দিতে পারে। যদিও এটিকে কেন্দ্র করে দুই দেশের ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের বিষয়ও হতে পারে।

5 | সীমান্তের নিকটে থাকা চরের ঐতিহাসিক ব্যখ্যা

ভূ-রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমানা ঘেঁষা চর এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে দেখার বিষয় হল স্বাধীনতার সময় সীমান্ত নির্মাণে কিছু অঞ্চলে সীমারেখা টানার সময় নদীকে বিভাজনকারী রূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে সীমান্তেরও ভাসমান অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলি প্রায়ই তাদের পথ পরিবর্তন করে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় র‍্যাডক্লিফ যে মানচিত্র ব্যবহার করেছিলেন, তাতে নদীগুলোর অবস্থান বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে অনেক সময় মিলত না। এই কারণে সীমান্ত নির্ধারণে মানচিত্র অনুযায়ী চলবে, নাকি বাস্তব নদীপথ অনুসরণ করা হবে-এই নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের (পরবর্তীতে বাংলাদেশ) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। আরেকটি বিষয় বিভাজনের ফলে দেখা দিয়েছিল, তা হল স্বাধীনতা পরবর্তী ভবিষ্যতে নদীগুলি আবার পথ পরিবর্তন করলে কি সীমান্ত সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে, নাকি তা স্থির থাকবে। পদ্মা নদীতে রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মাঝামাঝি যে চরগুলো গঠিত হয়েছিল, সেগুলিও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বড় বিরোধের উৎস হয়ে দাঁড়ায়, কারণ র‍্যাডক্লিফ কমিশন পদ্মা নদীর চরগুলিকে নিয়ে বিবেচনা করে দেখেনি।[17] এখানে যেহেতু নির্দিষ্ট সীমান্তরেখা নিয়ে বিতর্ক ছিল, তাই কিছু চর অনিশ্চিত অবস্থানে ছিল এবং উভয় পক্ষই সেই চরগুলোর মালিকানা দাবি করত। চরগুলো তখন যেমন, আজও তেমনই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ভারত ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর জন্য। একটি চর নিয়ন্ত্রণে রাখা মানে সেই রাষ্ট্রের জন্য এমন একটি জায়গা পাওয়া, যেখান থেকে সীমান্তের অপর পাশের কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখা সম্ভব। আবার একই যুক্তিতে, সেই চরে বিদেশি সেনাবাহিনী বা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের উপস্থিতি অপর দেশের নিরপত্তায় বিঘ্ন ঘটত।[18] সীমারেখা নির্মাণে র‍্যাডক্লিফ কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিভাজনরেখা হিসাবে উত্তর থেকে দক্ষিনে বহমান নদীকে ধরা হয়।[19] অনেক সময় নদীর বাঁকের কারণে সীমানার অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু নদীর পরিবর্তনে পূর্বের স্থান চরের রূপ ধারণ করে, ফলে চরের অবস্থান সংকটের আকার ধারণ করে।[20] এখানে চর হয়ে ওঠে দুই দেশের ক্ষেত্রে কৌশলগত অবস্থান যার ফলে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত জয়া চ্যাটার্জি 'The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52' লেখায় দেখান- ভৌগোলিক বা 'প্রাকৃতিক' সীমানাগুলিও সীমান্ত চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর ছিল না। বরং, সেগুলি আরও বেশি অস্পষ্ট ছিল। কারণ র‍্যাডক্লিফ লাইনের অংশ হিসেবে যে কয়েকটি নদী নির্ধারিত হয়েছিল, সেগুলোর উৎস ছিল হিমালয়ের গলিত হিমবাহ এবং সেগুলি সারা বছরই প্রবাহিত হত। ফলে বর্ষাকাল ছাড়া বছরের বাকি সময় নদীগুলি শুকিয়ে একেবারে ক্ষীণ ধারায়

[16] Lands and communities in flux: the chars in the Ganga-Brahmaputra deltaic region, Debdatta Chowdhury, Presses universitaires de la méditerranée, November,2020.

[17] তদেব।

[18] Some Stories from the Bengal Borderland: Making and Unmaking of an International Boundary,Bengal Borders and Travelling Lives , Anwesha Sengupta,CRG Report,2012.

[19] The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52, pp. 103.

[20] সঙ্কট বলতে আমি দুই দেশের আধিকারিকদের মধ্যে চরের দাবী নিয়ে তৈরি হওয়া বিবাদ নিয়ে আমি বলছি।

প্রবাহিত হতো। উদাহরণস্বরূপ, মাথাভাঙ্গা নদী, যা নদিয়া জেলার দুই ভাগের সীমানা নির্ধারণ করেছিল, সারা বছর সম্পূর্ণ শুকিয়ে থাকে, শুধু বর্ষাকালে কিছুটা জল থাকে। কিন্তু একবার বৃষ্টি শুরু হলে, এই নদী বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করত, ফলে সীমান্ত পুরোপুরি অস্পষ্ট হয়ে যেত। অত্যধিক এবং অবিরাম বৃষ্টিপাতের সময় জেলার পশ্চিম অংশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে জেলা সদর দপ্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং পরিবহন ও যোগাযোগের একমাত্র পথ অচল হয়ে যেত। সুতরাং, বছরের কয়েক মাস এই সীমান্ত অংশ শুধু অদৃশ্যই ছিল না, তা ছিল অপ্রবেশযোগ্যও; যার ফলে সীমান্ত নিরাপত্তা ও প্রশাসনের উপর বিপর্যয়কর প্রভাব পড়ে।[21] এমনকি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী নদীগুলিও সীমান্ত হিসেবে ব্যবহার করা হলে সমস্যা তৈরি করত। এসব নদী যে কোনো সময় তাদের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারত। র‍্যাডক্লিফ নদিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশের সীমান্ত নির্ধারণে মাথাভাঙ্গা নদীকে নির্ধারিত করেছিলেন, যেখান থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর শাখা গঙ্গা নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। *"কিন্তু সমস্যা ছিল, অনিয়মিত মাথাভাঙ্গা তার পুরনো পথ ছেড়ে একটি নতুন পথে প্রবাহিত হচ্ছিল, যা আগের উৎসস্থল থেকে কিছুটা পশ্চিমে ছিল। র‍্যাডক্লিফ যে মানচিত্র ব্যবহার করেছিলেন তা বঙ্গ সরকারের প্রেস থেকে ছাপা মানচিত্র (Bengal Government Press map)- তাতে এই নতুন পথটি দেখানো হয়নি"*[22] এর ফলে একটি গুরুতর ত্রুটি ঘটে। প্রায় ৫০০ বর্গমাইল জমি পাকিস্তানের(বর্তমানে বাংলাদেশ) অংশ হয়ে যায়, যা আদতে ভারতের হওয়া উচিত ছিল। এখানেই সমস্যা শেষ হয়নি- তদুপরি, এর কোনো নিশ্চয়তা ছিল না যে বাংলার চঞ্চল প্রকৃতির নদীগুলি দেশভাগের সময় যে পথে প্রবাহিত হচ্ছিল, তা বছরের পর বছর সময় একই পথ ধরে রাখবে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে এরকম একটি পথ পরিবর্তনের ঘটনা, ইছামতি নদীতে দেখা যায়। এই নদী খুলনা ও চব্বিশ পরগনার সীমান্ত নির্ধারণ করত, হাসনাবাদ থেকে প্রায় ষোলো মাইল দক্ষিণে একটি নতুন পথে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। 'নতুন এই ধারা একটি বাঁকা পথ নিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে ঘুমটি নামক স্থানে মূল নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে"।

পদ্মা নদী, যা মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার মধ্যে বিভাজন রেখা ছিল, সেই নদীতে অসংখ্য চর ছিল। এই চরগুলোই পরবর্তীকালে একটি বিরোধপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। জেগে ওঠা চরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সীমান্ত বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ প্রায় প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "মজহারদিয়ার বা মজারদিয়া নামে পরিচিত একটি বিতর্কিত চর ১৯৪৭ সাল থেকেই একটি বড় সংঘর্ষস্থল ছিল। ভারতের সরকারের মতে, এই চরটি মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর থানার অন্তর্গত। তবে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে পাকিস্তান বর্ডার ফোর্স এই চরটি 'দখল' করে। ১৯৪৮ সালের নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত এটি অসমাপ্ত কাজ-এর তালিকায় ছিল অর্থাৎ, এটি এমন একটি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল যেটি ভারতীয় রাষ্ট্রের দ্বারা "দখল" করা বাকি। আরেকটি বিতর্কিত চর ছিল আসারিদহা চর, যেটি নিয়েও উভয় রাষ্ট্র নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। যদি ১৯৪৮ সালের জুন-জুলাই মাসে পাকিস্তান বর্ডার ফোর্স এবং সশস্ত্র বাহিনী সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করে থাকে, তাহলে ভারতীয় বাহিনী ৮ ও ৯ নভেম্বর, ১৯৪৮ সালে দুটি ক্যাম্প স্থাপন করে এবং সেই চরটি পুনরায় "দখল" করে। একই রকম ছবি দেখা যেত উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্ত এলাকায়। এখানে পুরনো পথ ও নতুন স্রোতের মাঝখানে একটি জনমানবহীন জমি জেগে উঠেছিল, যা পরিণত হয়েছিল একটি চর অঞ্চলে। ইছামতি নদীতে জেগে ওঠা এই নতুন ভূমির নাম ছিল 'তারাধর চর', যার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় দুই মাইল এবং প্রস্থ প্রায় এক মাইল। এই ছোট্ট ভূখণ্ডটি জোয়ারের সময় জলের নিচে ডুবে যেত, কিন্তু ভাটার সময় জেগে উঠত এটি তার অবস্থানের কারণে কৌশলগতভাবে দুই দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল"। পুরো নদীর নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি ছিল মূল চাবিকাঠি। উভয় পক্ষই দ্রুত এই বিষয়টি উপলব্ধি করে, এবং 'তারাধর চর' এক উত্তপ্ত সংঘাতের কেন্দ্রে পরিণত হয়, ফলে দুই দেশ এটিকে জোরপূর্বক নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এরকম মুখোমুখি সংঘর্ষ অন্যান্য চরগুলিতেও নিয়মিত ঘটনা ছিল।[23] ১৯৪৭ সালের শেষার্ধ থেকে চরকে কেন্দ্র করে নিরবচ্ছিন্ন বিরোধ ও অশান্তি শুরু হয়, যা প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইন্টার-ডমিনিয়ন সম্মেলনের পর উভয় দেশ সম্মত হয়েছিল যে বিদ্যমান চরগুলো দখল না করে 'নো-ম্যানস-ল্যান্ড' হিসেবে রাখা হবে। কিন্তু এই চুক্তি প্রায়শই লঙ্ঘিত হতো, বিশেষত নতুন করে প্রতি বছর যখন নদীর জল কমে যেত ও নতুন চর জেগে উঠত সেইগুলো এই চুক্তির আওতায় ছিল না। ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই এই নতুন চর দখলের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, যা দু'দেশের মধ্যে বিদ্বেষ আরও গভীর করে তোলে।[24]

[21] তাঁর এই লেখায় এই বক্তব্যটি আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল নদী সীমান্তের পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য আমি আলোচনা করেছি। এখানে উনি লোকাল পুলিশের অফিশিয়ালের বক্তব্যকে উল্লেখ করছেন।

[22] এখানে তিনি বলেন 'although it had been shown correctly on the updated Revenue and Survey Department map',.

[23] এখানে তিনি বলেন 'although it had been shown correctly on the updated Revenue and Survey Department map',.

[24] The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52, pp. 105

র‍্যাডক্লিফ নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সীমান্তের সঙ্কট তৈরি হতে পারে সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেননি। এটি গুরুতর ত্রুটি, বিশেষ করে এমন একটি প্রদেশে যেখানে নদীগুলির নতুন পথে প্রবাহিত হওয়ার চরিত্র ছিল। স্বাভাবিক ভাবে তিনি চর নিয়েও কোনো বিবেচনা করেননি। যদিও এটি ছিল বাংলার সব বড় নদীতেই তৈরি হওয়া একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রফেসর চ্যাটার্জি বিশ্লেষণ করে বলেন র‍্যাডক্লিফ সম্ভবত জানতেনই না যে এরকম চরগুলোর বাস্তবে কোন অস্তিত্ব আছে; নাহলে তিনি অবশ্যই বুঝতে পারতেন এগুলো কত ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। পদ্মা নদীর কিছু চর এত বড় ছিল যে সেখানে সম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে উঠেছিল, এবং এই চরবাসীরা দীর্ঘমেয়াদি টানাপোড়েনের শিকার হন। চরে কিছু মানুষ ছিলেন যারা সীমানা সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করতেন তাদের মধ্যে *"বীরেন মণ্ডল একজন ব্যাক্তি ছিলেন, যিনি পদ্মার রাজনগর চরে বসবাস করতেন। তার বাড়ি ছিল খড়ের ছাউনিযুক্ত কয়েকটি কুটির নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে দুটি পড়েছিল পাকিস্তানের রাজশাহীতে, আর বাকিগুলো ভারতের মুর্শিদাবাদে। এক পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয় ও পাকিস্তানি উভয়পক্ষের সেনারা তাদের 'আনুগত্য দাবি করত'। তবে এটুকু জানা যায়, তার এক প্রতিবেশী বিষ্ণু প্রামাণিক দুই দেশের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে মারা যান"।*[25] তিনি আরও বলেন এধরনের সঙ্কট এড়ানো যেত বা অন্তত হ্রাস করা যেত, যদি র‍্যাডক্লিফ ও বাউন্ডারি কমিশনের সদস্যরা তাদের কাজ আরও যত্ন, সংবেদনশীলতা ও বাস্তব জ্ঞান নিয়ে করতেন। বরং, 'তাঁদের কাজের গোঁড়ামি ও গা-ছাড়া মনোভাব' বিস্ময় জাগায়। র‍্যাডক্লিফ ভারতে আসেন ৮ জুলাই; বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের শুনানি হয় মাত্র ১৬ থেকে ২৪ জুলাইর মধ্যে, আর তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দেন ১২ আগস্টে।[26] তিনি কমিশনের একটিও প্রকাশ্য শুনানিতে নিজে উপস্থিত ছিলেন না শুধু বিভিন্ন পক্ষের দাখিল করা কাগজপত্র পরীক্ষা করেই তিনি এ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন। যে ভূখণ্ডটি ভাগ করার দায়িত্ব র‍্যাডক্লিফের উপর অর্পিত হয়েছিল, তার প্রকৃত জটিলতা সম্পর্কে তিনি কোনও বাস্তব ধারণাই পাননি। যদি মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার নদী গুলোকে আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হতো, তবে মাথাভাঙ্গা নদীর নতুন পথ বা চরগুলোর অস্তিত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অনায়াসেই ধরা পড়ত। কিন্তু মনে হয়, এমন একটি জরিপের প্রয়োজনীয়তা কেউই অনুভব করেননি, এমনকি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারাও এই বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি।[27] সীমান্তবর্তী জেলার পুলিশ, রাজস্ব কর্মকর্তা কিংবা প্রশাসনিক কর্মচারীদের কাছ থেকেও কোনো পরামর্শ নেওয়া হয়নি। অথচ, তারাই সরজমিনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দিতে পারতেন। এই ভুল ও অবহেলার চরম মূল্য দিতে হয়েছিল সাধারণ মানুষদের। তাঁদের এই অবিশ্বাস্য অসতর্কতা এবং তাড়াহুড়োর ফলেই হাজারো নিরীহ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছিল।[28] ভারতের বিভাজনের (১৯৪৭) সময় চরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়, যখন উদ্বাস্তুরা এই চরগুলোকেই তাদের অস্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী বসতির জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। নতুন করে সীমান্ত নির্ধারিত হওয়ার পর, অনেক চর ভারতের নতুন সীমান্তের ওপারে রয়ে যায়, যেখানে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। চরগুলিতে বসবাসকারী ব্যাক্তিরা ছিল মূলত কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ।[29] অন্যদিকে যারা মূল ভূখণ্ডের শহর বা শহরতলিতে বসতি গড়েছিল, তারা সাধারণত শ্রমজীবী বা মধ্যবিত্ত পেশাজীবী ছিলেন। যখন এই কৃষক উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়ার পালা এলো, তখন শহর ও আশপাশের এলাকা ইতোমধ্যেই ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ফলে তাদের সেখানে বসবাস করা কঠিন হয়ে ওঠে। তখন জনবসতিহীন চর এবং সুন্দরবনের কিছু দ্বীপ তাদের শেষ আশ্রয়স্থলে নির্বাসিত হয়। চরে বসবাস কখনোই চরবাসীদের জন্য প্রথম পছন্দ ছিলনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা দেরিতে আসা উদ্বাস্তু, যারা চরে বসতি স্থাপনে বাধ্য হয়েছিল, অথবা তারা এমন উদ্বাস্তু যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার পথে রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছিল।[30]

6 | মূল ভূমীতে অবস্থিত চর-জীবনের সঙ্কট ও সম্ভাবনা

সীমান্তে চরের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা চর জীবনের অনিশ্চয়তার সাথে সীমানা নির্মাণের অনিশ্চিত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে জীবিকা নির্বাহের থেকে বসবাসের ভাসমানতা বরাবরই সংকটের সম্মুখীন হতে দেখা গেছে। যেখানে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের কারণে মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উদ্বাস্তু স্বীকার হতে হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে মূল ভুমিতে স্থান না পেয়ে চর ভুমিতে বসবাস করে। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সূত্র ধরে মূল অঞ্চলের চরে

[25]এখানে আমি এই অংশটা জয়া চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে তুলে ধরছি সে সময়ের চরের পরিস্থিতিকে বোঝানোর জন্য। চর সীমান্তের বিষয়াবলী নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এটি তার মধ্যে একটি অংশ যা সীমান্ত বিভাজনের পর ঘটেছিল।

[26] The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52, pp. 105.

[27] তদেব

[28] Some Stories from the Bengal Borderland: Making and Unmaking of an International Boundary Anwesha Sengupta, Bengal Borders and Travelling Lives, CRG,2012.

[29] তদেব

[30] তদেব

বসবাসকারী মানুষের অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি এখানে পরিস্ফুট হবে। তাই সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চর একেবারে মানুষের বসতির প্রান্তসীমায় (সেটা মূল ভূমি বা সীমান্ত ভূমি দুটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অবস্থিত। এই চরভূমি প্রান্তিক জনগণের জন্য উপযুক্ত, কারণ তারা সাধারণত অবহেলিত বা বহিষ্কৃত।

চর জগৎ এক ধরনের জল-ভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চল, যার অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি অনুমোদনহীন বাংলাদেশি অভিবাসীদের মতো অস্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য বেশ উপযোগী। বাংলায় 'চর' নামে পরিচিত নদীর দ্বীপসমূহ নিম্নবঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলে সাধারণত দেখা যায় এবং সেগুলো প্রায়শই অনুমোদনহীন অভিবাসীদের বসতির উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এধরনের চরভূমি সাধারণত অস্থায়ী, স্থানান্তরশীল ও বন্যাপ্রবণ হয়ে থাকে, যদিও কিছু চর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিশীল হয়ে ওঠে, তবুও আইনগতভাবে এগুলো "ভূমি" হিসেবে স্বীকৃত কিনা, তা অবশ্য বিতর্কিত বিষয়। যারা উপযুক্ত নথিপত্র ছাড়া বাংলাদেশ থেকে ভারতে অভিবাসন করেছেন। সামান্য বা একেবারে না থাকার মতো সম্পদ নিয়ে চরুয়ারা অনিশ্চয়তাপূর্ণ ভূমিতে টিকে থাকার জন্য দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম করে চলেছেন। চরভূমিগুলোতে বহু মানুষ বহু বছর ধরে বসবাস করে, ঘরবাড়ি গড়ে তোলে, গবাদিপশু ও কৃষিজমিতে ফসল ফলায় কিন্তু হঠাৎ নদীর খেয়ালে একেবারে কয়েক দিনের মধ্যে পুরো চরভূমি বিলীন হয়ে যেতে পারে সে সম্ভাবনাও থাকে। আবার কিছু চর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী বসতিতে পরিণত হয়, তা নির্ভর করে পলিমাটির প্রকৃতি ও নদীর প্রবাহের ওপর। এই ধরণের চরভূমি উত্তর বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের গঙ্গার সমভূমিতে 'দায়ারা' হিসেবে পরিচিত। বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় চর গড়ে ওঠে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, নতুন করে জেগে ওঠা প্রতিটি চর প্রথমে সরকারের মালিকানাধীন বলে গণ্য হয় এবং পরবর্তীতে ভূমি বন্দোবস্ত নিয়মের (Land Settlement Policy Resolution) ভিত্তিতে সরকার মালিকানা নির্ধারণ করে। তবে বাস্তবে, চর দখলের ক্ষেত্রে কোনো সরকারি অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা হয় না। চর যখনই জাগে, মানুষ বসতি গড়ে তোলে, যতক্ষণ না সরকারিভাবে এই বন্দোবস্ত নিশ্চিত হয় বা চরটি আবার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় ততোক্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বসতিগুলোকে অবৈধ দখল বলে চিহ্নিত করা হয়। উপরন্তু, চরে আইনগত বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। এর একটি বড় কারণ হলো "অবৈধ অভিবাসন"-এর ইস্যু, যা প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগ তৈরি করে। সেইসঙ্গে মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য প্রশাসনের বিরোধিতায় আরও সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে ভূমি সংক্রান্ত আইন ও রাজনৈতিক স্বার্থ একসঙ্গে মিশে গিয়ে চরে অধিবাসীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানকে জটিল ও প্রায়শই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবিত করে।

7 | চরে অভিবাসীরা

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত এবং গোপা সামন্ত তাঁদের Fleeting Land, Fleeting People: Bangladeshi Women in a Charland Environment in Lower Bengal, India. লেখায় দেখানো হয় বাংলাদেশ থেকে ভারতে অভিবাসনের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এই অভিবাসন মূলত ধর্মীয় নিপীড়ন, পরিবারের উপার্জনের অভাব, তাছাড়া সামাজিক অস্থিরতা তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। তুলনামূলক অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য সংখ্যার হার বেশি। কাজের অভাব এবং সম্পদের অসম বন্টন মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। আবার অনেকে ধর্মীয় নিপীড়নের ফলে বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপত্তাহীনতার কারণে ভারতে চলে আসেন। যেসব অভিবাসীরা সরাসরি এই চরে এসেছেন, তাদের পূর্বে বসবাসকারী অনেক আত্মীয়ই এখানে আছে সেটা প্রায়শই দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিচিত আত্মীয়দের সাথে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে মাইগ্রেট করে। এটা শুধু মাত্র চরের চিত্র নয়, সাম্প্রতি তিন-চার দশকে মূল ভূমির গ্রামে অভিবাসী জীবনের গোষ্ঠীবদ্ধ পরিযান লক্ষ্য করা যায়।[31] অভিবাসী পরিবার বাংলাদেশ ত্যাগ করার আগে একজন পরিচিতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে- যেমন প্রতিবেশী বা গ্রামের কেউ যিনি আগেই চলে এসেছেন এবং তাঁর সহায়তায় ভারতে কিছুটা নিরাপত্তা পান। এই ধরনের অভিবাসন সাধারণত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। সীমান্তের নিকটবর্তী অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ থেকে আসার পর এই চরগুলোতে আশ্রয় নেওয়া সহজ এবং সীমান্তে বসবাসকারী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। এরা সীমান্ত পেরিয়ে মূলত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন জায়গায়- যেমন বাসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, হাবড়া, তাছাড়া অন্যান্য বর্ডার ডিসট্রিক্ট গুলোতে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় নেয়। এখানকার আত্মীয়দের সহায়তায় তারা ভারতে থাকার সুযোগ পান। চরের বেশিরভাগ অভিবাসী পরিবার ঐ এলাকায় আসার আগে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন

[31] মূলভূমি হোক অথবা চরভূমি দুটো ক্ষেত্রেই একই চিত্র দেখা যায়। তুলনামূলক চরভূমিতে মানুষ থাকার অধিক সুযোগ (চাষের জমি, বসবাসে বেশি জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে) পায় তাই অভিবাসী মানুষের বসবাসের প্রবণতা বেশি। অন্যদিকে মানুষের মূলভূমীতে ফাঁকা জায়গার পরিমাণ কম, তাই তাদের বসবাস স্থাপন করার চাহিদা ও কম। তবে আত্মীয়ের বসবাস থাকলে তাদের সেই স্থানই প্রথম পছন্দ।

জায়গায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই চর বেছে নেন, কারণ এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণ চাষযোগ্য জমি সহজে পাওয়া যায়-যা সীমান্তবর্তী এলাকায় পাওয়া কঠিন। তাছাড়া সীমান্তের ওপার থেকে আসা অভিবাসীরা সীমান্তের নিকটে স্থায়ী ভাবে বসবাস করলে সীমান্ত রক্ষীদের নজরাধীন নিরাপত্তার মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে তাদের নিশ্চিত নিরাপত্তার কারণে সীমান্ত ভূমি থেকে দূরে মূল ভূমির মধ্যে অবস্থান করে।

চরবাসীদের মধ্যে আত্মীয়তা ও প্রতিবেশী নেটওয়ার্ক(যোগাযোগ সম্বন্ধীয়) অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক। প্রায়শই দেখা যায় যে, একটি সম্পূর্ণ গ্রামই একই পরিবারের সদস্য বা এক গ্রামের অভিবাসীদের দ্বারা গঠিত। সাধারণত, আগত অভিবাসীদের বসতি স্থাপনে সাহায্য করেন তাদের আগে আসা আত্মীয় বা গ্রামের পরিচিতরা। চরগুলো এক অর্থে রাষ্ট্রহীনদের জন্য নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। অনেক অভিবাসী এখান থেকে নিজেদের অবৈধ অবস্থানকে ধীরে ধীরে বৈধতার পথে নিয়ে যেতে চান। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি নিয়ম বহির্ভূত কিন্তু সাংগঠনিক একটা নেটওয়ার্ক কাজ করে যেখানে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, পঞ্চায়েত সদস্য এবং ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তারা অভিবাসীদের ভোটার আইডি, রেশন কার্ডের মতো বৈধ নথিপত্র সংগ্রহে সাহায্য করেন। এর মাধ্যমে অবৈধ চরবাসীরা ধীরে ধীরে নাগরিকত্বের দাবিদার হয়ে ওঠে। চরভিত্তিক অভিবাসন পথ খুবই জটিল। সাধারণত অভিবাসীরা সরাসরি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যান না, বরং বিভিন্ন গন্তব্যের মধ্যে একটি চক্রাকার চলমানতার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আগত ব্যক্তি আগে থেকেই সেখানে বসবাসকারী আত্মীয় বা গ্রামের কারও সহায়তায় চরে আশ্রয় নেন, যারা তাদের কাজ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন।[32] অনেক সময় বেআইনি উপায় বা স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় কোনো বাংলাদেশি ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য বৈধ কাগজপত্র অর্জন করতে পারেন। রেশন কার্ড নাগরিকত্বের প্রাথমিক ধাপ হয়ে, চরভূমির মতো "নো-ম্যানস ল্যান্ড"-এ বসতি স্থাপন করতে এবং ঘুষ বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বৈধ নাগরিকপত্র সংগ্রহ করতে প্ররোচিত করে। এই আলোচনায় দেখানো হয়েছে চরভূমির মতো অস্থায়ী ও সংকটপূর্ণ পরিবেশে বসবাসরত অভিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁদের বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে বোঝার চেষ্টা করেছেন। বৈধ নথিপত্র ছাড়া পরিবারসহ বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন কাজের উদ্দেশ্যে। যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেই সময়ের সঙ্গে কিছু বৈধ কিংবা জাল নথিপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে যাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তবে সকলেই ধর্মীয় সাদৃশ্যের কারণে ভারতে এসেছেন, এমন নয়।

চরভূমিতে বসবাস করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। এখানে জীবন অনিশ্চিত এবং কঠিন। চরাঞ্চল হলো অস্থায়ী আশ্রয়স্থল, যেখানে প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অভিবাসীরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। বন্যা ও নদীভাঙনের কারণে প্রতি বছর বহু মানুষ তাঁদের বসতভিটা হারান। ভাসমান জীবনের জীবিকা ও কাজের নিরাপত্তার সঙ্কট সবসময় দেখা যায়। চরের জমি সরকারিভাবে স্বীকৃত নয়, ফলে অভিবাসীরা এখানে বসবাস করলেও ভূমির উপর তাঁদের কোনও বৈধ অধিকার থাকে না। তাছাড়া, সরকারি সেবা ও নাগরিক অধিকার না থাকায় তারা সামাজিক বৈষম্য ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হন। বেশিরভাগ চরবাসীর রেশন কার্ড, ভোটাধিকার বা সরকারি সেবা পাওয়ার সুযোগ নেই, কারণ তাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাননি। অনেক অভিবাসীদের কাছে সাধারণত ভোটার আইডি, রেশন কার্ড বা বৈধ কাগজপত্র থাকে না। সরকারি কোনো সহায়তা না পাওয়ায় তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও ত্রাণ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন। অনেক সময় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই দুর্বল জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে। অনেকেই আইনি নথি ছাড়া ভারতে প্রবেশ করেন, ফলে তারা সামাজিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের শিকার হন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা স্থানীয় সমাজের মূলধারায় যুক্ত হতে না পারায় চরবাসীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এলাকাবাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। অনেকে সরাসরি চরে আসেনি। তারা বহুবার স্থানান্তরিত হওয়ার পর অবশেষে চরে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। নদীর চরগুলি প্লাবনের কারণে বারবার পরিবর্তিত হয়, ফলে জমি ও ঘরবাড়ি হারানোর ঝুঁকি সর্বদা থেকে যায়। সামাজিকভাবে মূলধারার সমাজ তাদের সহজে গ্রহণ করে না, ফলে তাঁরা প্রান্তিক অবস্থানে থাকেন। অভিবাসীদের 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে দেখা হয়, ফলে তারা সবসময় উচ্ছেদের আতঙ্কে থাকেন। পুলিশ ও প্রশাসন অনেক সময় তাদের হয়রানি করে, ঘুষ দিয়ে টিকে থাকার পরিস্থিতি তৈরি হয়। নারীরা বিশেষভাবে সহিংসতা ও নির্যাতনের ঝুঁকিতে থাকেন, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আইনগত সাহায্য পেতে ব্যর্থ হন।

[32] Fleeting Land, Fleeting People: Bangladeshi Women in a Charland Environment in Lower Bengal, India, Kuntala Lahiri-Dut,Gopa Samanta,Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 13, No. 4, 2004.

মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত চরে বসবাসকারী অভিবাসীদের প্রক্রিয়াটি অনেকটা জটিল ও অস্পষ্ট। এটি অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এবং গবেষণায় কম আলোচিত একটি ক্ষেত্র, কারণ চরগুলিতে যাতায়াত অনেক সময়েই দুর্গম হয়। সাধারণত ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে চর-অভিবাসন ঘটে; তবে স্থানীয় প্রশাসন, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অভিবাসীরা সম্মিলিত ভাবে এক নীরব সমঝোতায় বসতি গড়ে তোলে। চরের বাসিন্দাদের—চরুয়া (চরের মানুষ) বলে চিহ্নিত করা হয়। চরের উর্বরতা ও মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই জায়গাকে অনুমোদন ছাড়াই অভিবাসীদের জন্য আদর্শ বাসস্থান করে তুলেছে। তাঁদের কৃষিকৌশল ও মাটি ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতায় প্রায় সব চরই এখন চাষযোগ্য হয়ে উঠেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও স্থানীয় ক্ষমতাবানদের নির্ভরতাভিত্তিক আধিপত্যের শিকার হন।

মূল ভূখণ্ডে নদীর চরে জীবনের নিরাপত্তা-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক, ইত্যাদি কারণে বিপন্ন হয়। এটা এই এলাকার মানুষের কাছে অনেকটা স্বাভাবিক। যদিও ঐ অঞ্চলে মানুষের অভিবাসী জীবনের জন্য ব্যাক্তি ও সামাজিক পরিসরকে অনেকটা প্রভাবিত করে। তবে চর সীমান্তের মানুষের নাগরিকতা ও সামাজিক সংকটের প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ছার পায়। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতার ফারাক নেই- সে বিষয়ে আমার ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চলের বিষয় তুলে ধরলে অনেকটা স্পষ্ট হবে। এখানেও অনিশ্চিত ভূমির সুনিশ্চিত জীবন-যাপনের অভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পরের অংশে সেই বিষয়আলোচনা করা হবে।

৪ | তারকাঁটা-মুক্ত সীমান্ত লাগোয়া মুর্শিদাবাদে চরের ব্যাখ্যা

মুর্শিদাবাদের ভৌগলিক সীমানা অনুযায়ী পশ্চিমবাংলার কয়েকটা বড় জেলা গুলোর মধ্যে একটি অন্যতম বড় জেলা, একই সাথে এই জেলার চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বহুমাত্রিক। পদ্মা এবং ভাগীরথী নদীর উপস্থিতি এলাকার মাটি উর্বর করছে। জেলাটির পূর্বদিকে অবস্থান করে আছে ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সীমানা। সীমারেখাটি উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর টেনে দেওয়া হয়েছে। প্রায় বেশিরভাগ এলাকায় সীমান্তটি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। কোথাও আবার পদ্মানদীই আন্তর্জাতিক বিভাজনরেখা টেনে দিয়েছে দুই দেশের ভৌগলিক সীমানাকে। ভারত-বাংলাদেশের বর্ডারের তিন ধরণের প্রকৃতি দেখা যায়, যথা- ল্যান্ড বাউন্ডারি(ভূমি সীমান্ত), রিভার বাউন্ডারি(নদী সীমান্ত) এবং চর সীমান্ত। তিন রকমের মধ্যে প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চলের আলোচনায় পদ্মানদীর প্রবাহে সৃষ্ট চর নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তুলনামূলক দিক থেকে ঐতিহাসিক আলোচনায় চরের বিশেষত্ব ও মূল ভুমির মধ্যে অবস্থিত চরের ভূমিকা থেকে ভিন্ন, সীমান্তের এই ভূখণ্ডটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটাই উঠে আসবে।

পদ্মানদীর গতিপথ অনুযায়ী অনেক জায়গায় চরের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক চর আবার সীমান্ত লাগোয়া। তার মধ্যে কিছু চর এলাকা কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম, তা হল- পশ্চিম চরগোঠা, নারুখাকি, জোট বিশ্বনাথ, হঠাৎ পাড়া, পিরোজপুর, বাজিতপুর। এই চরগুলো মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া সীমানা বরাবর অবস্থান করে আছে। চারিত্রিক-গত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অন্যান্য সীমান্ত থেকে আলাদা। সীমান্ত লাগোয়া চরে অবস্থানকারী এই গ্রাম-গুলোর বেশির ভাগ তারকাঁটা বিহীন আন্তর্জাতিক সীমানা। এই উন্মুক্ত রাজনৈতিক সীমারেখা লাগোয়া গ্রাম-গুলোতে বিগত প্রায় চার থেকে পাঁচ দশক ধরে মানুষ বসবাস করছে। চর ভূখণ্ডের বিভাজনকারী পিলার ছাড়া কিছু নেই। পিলারই এখানে একমাত্র সীমানার বিভাজনরেখার প্রমাণ রূপে দেখা যায়। সেকারণে আপাত দৃষ্টিতে ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে দুই দেশের পার্থক্য বোঝা অসম্ভব। তবুও দুই দেশের মানুষের নাগরিক-সত্তার বিভাজন দেখা যায়। চর সীমান্তের বিভাজনকারী তারকাঁটার অ-বর্তমানে এলাকার মানুষের মধ্যে দুই দেশের জাতি সত্তার বিভেদের ধারণাটি অবশ্যই লক্ষণীয়। আসলে এটা জাতিসত্তার বিভেদ না বলে নেশানের মধ্যেকার বিভাজন বলাই সঙ্গত হবে। তবে জাতিসত্তার ক্ষেত্রে দুই দেশের বিভাজন নেই, কারণ ভাষা সংস্কৃতি এক।[33] কিন্তু নেশান-স্টেট নিরিখে তারা ভিন্ন। অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন ‘জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের দাবি ছাড়া নেশান-স্টেট হতে পারে না’।[34] বিশ্বায়নের বেড়াজাল দিয়ে অনেকে অবশ্য রাষ্ট্রের গণ্ডি মুছে দিয়েছেন, কিন্তু দুই আন্তর্জাতিক সীমানার মোটা দাগের বাইরে অবস্থানকারী চর এলাকার মানুষ সীমান্তের গণ্ডি মুছে দিতে পারেনি। এই গণ্ডি যেহেতু একটি নেশান-স্টেটের স্বকীয়তার ধারক তাই ফিজিক্যাল সীমান্ত[35] না থাকা সত্ত্বেও দুই রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্রতা যেমন লক্ষণীয় বিভেদও তেমন বর্তমান। তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রের শর্ত না রক্ষা করতে পারলেও, ক্ষুদ্র শর্তের প্রমাণ তো অবশ্যই রক্ষা করছে।

[33] জাতিসত্তা বলতে ভাষার সাদৃশ্যের নিরিখে দেখা হয়েছে।

[34] জাতীয়তাবাদের সত্যি মিথ্যে,চার্বাক উবাচ,সব নেশানই আধুনিক, অনুস্টুপ, ২০২২।

[35] ফিজিক্যাল সীমান্ত বলতে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি- তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত। যেখানে সহজেই বোঝা যায় দুই দেশের বিভাজন রেখা।

সুতরাং তাদের মধ্যে এই বিভাজন অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করেছে, তবে এলাকার মানুষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিভাজন ছাড়া বাস্তবিক ক্ষেত্রে কোনো ফিজিক্যাল বা ভৌগলিক বিভাজন ছিলনা।[36] তার মূলকারণ ছিল একই ভাষাগোষ্ঠীর বসবাস। একই সাথে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল তারকাটা মুক্ত সীমান্ত। চাষাবাদ করে এবং উৎপন্ন ফসল দিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ হত। দুই বাংলার মাঝে অবস্থিত এই চরে শস্য জাতীয় ফসলের ফলন ছাড়া অন্য কোনরকম সব্জির চাষ হত না। এই ফসল দিয়ে মানুষের দিন গুজরান চলে যেত। গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই বলেন এই নদী প্রথমে খালের মত ছিল, বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময় নদীর জল খুবই কম থাকত। সাক্ষাৎকার দেওয়া অনেক মানুষ মনে করেন ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ হওয়ার পর বর্ষার সময় উত্তর থেকে আসা নদীর বাড়তি জল পদ্মানদী দিয়ে বইয়ে বাংলাদেশে যেত। সময়ের সাথে সাথে নদীর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নদীর পাশে থাকা চর গুলো ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। অঞ্চলের বাসিন্দাদের আশঙ্কা এই পর্যন্ত চরের ভাঙনের ফলে ভারতের দিকের চরের অংশ জলে তলিয়ে যাচ্ছে, এবং একটা সময় চরের কোন অস্তিত্ব থাকবেনা। নদী ভাঙনের ফলে চরের পুরো অংশটাই অন্যান্য গ্রাম গুলোর মত নদীগর্ভে চলে যাবে। ঐ চরে বসবাস যোগ্য মাটি থাকবেনা বলে অনেকেই আশঙ্কা করেন। কারণ চরের পরে ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা অবস্থান করে আছে। সুতরাং চর সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের কাছে ভারতের সীমানার আর মাত্র কয়েক কিলোমিটার চরের অস্তিত্ব টিকে আছে। বসবাস-যোগ্য এই চরের সামান্য কিছু ভারতের মাটি বেঁচে আছে। অস্থায়ী জীবিকার সংকট কিছুটা না থাকলেও বসবাসের সংকট আছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

9 | চর এলাকায় জনজীবনের অবস্থান ও একমাত্র প্রথাগত জীবিকা

বিগত চার থেকে পাঁচ দশক আগে এই চরের মানুষের বসতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল ২০০ টি পরিবার। প্রায় তিন থেকে চার হাজার মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল চারটি গ্রাম যথা-পশ্চিম চরগোঠা, নারুখাকি, জোট বিশ্বনাথ, হঠাৎ পাড়া। নদীর এই পাড় অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের মূল ভূমি রঘুনাথগঞ্জ এলাকার পাশের একটি গ্রাম কাটাখালি এবং অন্য পাড়ে চরের এলাকায় অবস্থিত নারুখাকি সহ বিস্তীর্ণ গ্রাম। এক পাড়ে কাটাখালি এলাকা পদ্মার অন্য পাড়ে নারুখাকি সহ অন্যান্য গ্রাম অঞ্চল। চরের এই গ্রামগুলো শেষ হওয়ার পর দুটি দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা। সত্তরের দশকের পূর্বে এই চরে অনাবাদি জমি মানুষের চাষের যোগ্য ছিলনা। দুই বাংলার থেকে আসা দুই পাড়ের(পদ্মার এপারে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে যাওয়া চরে বসবাসকারী মানুষ এবং সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশ থেকে আসা সাধারণ জনগোষ্ঠী) মানুষেরা জঙ্গল কেটে বসবাস শুরু করে। বসবাসের সময়টা ষাটের দশকের পর থেকে। আরও এক দশক ধরে তৈরি হওয়া চরের মাটি চাষের যোগ্য হয়ে উঠল। চাষ-আবাদই চরের মানুষের কাছে হয়ে উঠল জীবিকা যাপনের প্রধান মাধ্যম। চাষাবাদের শস্য গুলোর মধ্যে ধান, কলাই, পাট, তিল, সরষে ইত্যাদি হত। তা বিক্রি করার জন্য নদীর এপারে অর্থাৎ রঘুনাথগঞ্জ এর হাটে আসতে হত। চরের ভাঙন এবং প্রায় প্রতিবছর বন্যা হওয়ার পূর্বে জনজীবনের জীবিকা নির্বাহের এটি ছিল স্বাভাবিক ও নির্দিষ্ট।

এলাকার মানুষের কাছে সীমানা সম্পর্কে ধারণা থাকলেও জীবিকাই তাদের কাছে প্রাধান্য পেত। তাই ওপার বাংলার মানুষের সঙ্গে সীমান্তের সম্পর্কে মানসিক বিভাজন খুঁজে পাওয়া যেত না যতটা রাজনৈতিক বিভাজন ছিল। প্রথম দিকে নির্দিষ্ট এই অঞ্চলের জনজীবনের জীবিকা অন্যান্য মূল ভূমি (main land) অঞ্চলের থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। সময়ের সাথে চাহিদার পরিবর্তনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে (৮০র দশকের পর প্রায় প্রতি এক দুইবছর অন্তর বন্যায় প্লাবিত হয়ে যেত এই চর এলাকা) এবং নদী-দ্বারা চরের ভাঙনের ফলে অঞ্চলের জনজীবনের স্বাভাবিক যাপন ব্যাহত হত। একদিকে যেমন চরের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা পূরণের সঙ্কট, পাশাপাশি জীবিকার তাগিদ, স্থায়ী বসবাসের খোঁজে মুর্শিদাবাদের মূল ভূমিতে বসবাস করার নতুন উদ্যোগ ইত্যাদি; এই সব কিছুই এলাকার জনমানুষের জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরে নিয়েছিল।

10 | নদীর প্রবাহের ফলে চরের ভাঙন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জীবিকার পরিবর্তন

ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায় মুর্শিদাবাদের চর এলাকার মানুষের জীবিকার পরিবর্তন। ১৯৯৮ সালের পর থেকে এক দুই বছর অন্তর অন্তর প্রত্যেক বর্ষায় পদ্মার ভরা নদীর স্রোতে চরের পাড় গুলো ভেঙ্গে যেত। এপর্যন্ত চরর ভাঙন হয়েছে সাত-আট বার। এই চর এলাকাটি বেশিদূর বিস্তৃত ছিলনা কারণ পশ্চিম থেকে পূর্বে ৬-৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তার পর বাংলাদেশের সীমানা। নদী যেভাবে চরের মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে

[36] ভারত বাংলাদেশের বেশির ভাগ সীমান্তে কাঁটাতারের বিভাজন দেখা যায়। আবার বেশ কিছু এলাকায় উন্মুক্ত সীমানাও দেখা যায়, তার একটা বড় উদাহরণ এই চর সীমান্ত। তাই কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা সীমারেখার বিভাজনকে আমি ফিজিক্যাল বিভাজন বুঝিয়েছি। অন্যদিকে আমি মনস্তাত্ত্বিক বলতে উন্মুক্ত সীমান্তের নিকটে বসবাস সত্ত্বেও দুই দেশের মানুষের মধ্যে মানুষের নিজ জাতিসত্তার সচেতন হওয়াকে বুঝিয়েছি।

তার দরুন বেশীরভাগ মানুষ ঐ এলাকা ত্যাগ করে নদীর এপারে রঘুনাথগঞ্জ অথবা মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং বসবাসের নতুন ঠিকানা জোগাড় করে নিচ্ছে। তারকাটাঘেরা ল্যান্ড বর্ডারের ক্ষেত্রে সীমান্ত ঘেরা মূল ভূমিতে থাকা সীমান্তের চরিত্র একধরণের মাত্রা বহন করে। অন্য দিকে কাঁটাতার বিহীন চর সীমান্তের চরিত্র আরেক ধরণের। ২০০০ সালের পর থেকে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের কাছে কোন রকম স্থায়ী জীবিকা না থাকার কারণে মানুষ বাধ্য হয়েছে পেশার পরিবর্তন করতে। চর ত্যাগ করে যারা মুর্শিদাবাদের মূল ভূমিতে অবস্থান করেছে, বাঁচার তাগিদে সম্বল করে নিয়েছে নতুন পেশা। অস্থায়ী পেশা হয়ে উঠেছে জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। তাদের মধ্যে অনেকে নির্মাণ কর্মে আবার অনেকে দিন মজুর, অনেক ক্ষেত্রে কিছু মানুষ ক্ষুদ্রশিল্প কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। জীবীকার মাধ্যমে চরের মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সচল করে রেখেছে। এলাকার সাধারণ মানুষ কাঁটাতার বিহীন সীমানা পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে দিত নানান রকম দ্রব্য সামগ্রী। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চাল থেকে মসলা সব ধরণের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঐ পাড়ে পৌঁছে যেত বাংলাদেশ থেকে আসা ব্যাপারী দের মাধ্যমে। খোলা সীমান্ত থাকার দরুন এই কাজ করতে অন্য কোন নিরাপত্তা হীনতা ও জীবন সংশয়ের কোন বেগ পেতে হতো না। তাছাড়া স্বাক্ষাতকারে এটাও উঠে আসে সীমান্তে প্রহরায় থাকা বি এস এফ-রা গড়ে প্রতিটি দ্রব্যের জন্য ১০ শতাংশ কমিশন নিত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রাবাদি ছাড়াও গবাদি পশু এবং নেশাজাত দ্রব্য ঐ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হত। পারাপারের পুরো বিষয়টা একটি ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে পারাপার করে দেওয়া হত।

11 | বৈধতা, বসবাসের অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবিকা বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী এপারের চর থেকে বাংলাদেশে বিক্রি করে দেওয়া। দ্রব সামগ্রী পারাপারে নির্দিষ্ট ব্যাবস্থাপনায় কয়েকটা ধাপে অন্য পাড়ে অর্থাৎ বাংলাদেশে পার করা হয়। এই পারাপারের সম্পূর্ণ বিষয়টি এখানে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত আলোচনা করা দরকার বর্তমানে ঐ এলাকায় প্রায় ৯০ ঘর জনজীবনের অস্তিত্ব আছে। এবং প্রত্যেকের এপার অর্থাৎ রঘুনাথগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থায়ী বাসস্থান বর্তমান। অস্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা থেকেই নয়া বাসস্থানের প্রস্তুত। নদীর অন্য পাড়ে পারাপারের সুবিধা হওয়ার প্রধান কারণ তারকাটা-হীন সীমান্ত। অনায়াসে দ্রব্য সামগ্রী পার করতে সমর্থ হয়। পাশাপাশি ভারতের সীমান্ত রক্ষীদের মদতে কর্মকাণ্ডটি সম্পন্ন হয়, তার পরিবর্তে বি এস এফ দের শতাংশের হিসাবে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষের হিসাব ধার্য হয় দ্রব্য সামগ্রির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। চাল অথবা বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্যে ৫ শতাংশ হারে গরু বা অন্যান্য পশুতে ১০ শতাংশের হারে ঘুষ নেয়। ভোটের মুখে এই সীমান্ত এলাকাতে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকে। এমতাবস্থায় এলাকার মানুষ কিছুদিন পারাপারের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখে। ভোট পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর সীমান্তের কার্যকলাপ পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

একাধারে চরের বন্ধাত্ব যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছে। অপর দিকে চর মানুষকে জীবিকা নির্ধারণের নতুন পন্থা অবলম্বনে সহযোগিতা করেছে। এই নতুন পন্থা মূলত ওপার বাংলায় থাকা মানুষের সাথে দ্রব্যের প্রত্যহ লেনদেনের সুযোগ করে দিয়েছে। চরের অবস্থানকে কেন্দ্র করে অনেক ধরণের সুবিধার সাথে এলাকার মানুষ লাভ করতে পেরেছে দ্রব্য ও পণ্য সামগ্রী কেনা বেচায়। তার জন্য কিছু ব্যাবস্থাপনার মাধ্যম ব্যাবহার করতে হচ্ছে। দ্রাব্যাদি পারাপারের ব্যাবস্থাপনা তাদের কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে সম্পন্ন হয়।

12 | ক্ষেত্র-সমীক্ষার নিরিখে চরের যাপন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

গত কুড়ি বছর থেকে চরের বাসিন্দারা নিজেদের পেশার পরিবর্তন করে নিয়েছে। নয়া পেশার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে জীবন ধারণের উপায়। বর্তমান চরে অবস্থানকারী প্রায় প্রত্যেক বাসিন্দা বিভিন্ন দ্রব্যাদি পারাপারে কাজে নিজেদের নিযুক্ত করছে। এই সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ড থেকে উপার্জন হয় অনেক পরিমাণে টাকা। অনেকে বলেন প্রায় কুড়ি বছর থেকে তাদের ন্যুনতম মাসিক আয় হয় ৪০-৫০ হাজার টাকা। প্রায় সব ধরণের দ্রব্য সামগ্রী এবং গবাদি পশু সীমান্তে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের সহযোগিতায় পারাপারে সমর্থ হয়। গবাদি পশু এবং বেশি পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী থেকে বি এস এফ রা কমিশন তিন ভাগের এক ভাগ কমিশন নেয়। চরের মানুষের পদ্মার এপারে থাকা কাঁটাখালি এবং রঘুনাথগঞ্জ বাজার থেকে দ্রব্য সামগ্রীর জোগান হয়। পন্য সামগ্রীর মধ্যে বেশি লাভ করতে পারে চাল থেকে। তাছাড়া গবাদি পশু থেকে অনেক বেশি পরিমাণে আয় হয়। চালের কেনা থেকে শুরু করে ওপার বাংলাদেশে পার করার সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডটি একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রথমত চরে থাকা বাসিন্দারা এপারে মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু এলাকা থেকে চালের জোগাড় করে নেয়। যেসকল বাজার থেকে চালের জোগান হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রঘুনাথগঞ্জ এবং কাঁটাখালি বাজার। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন চরের মানুষ দামি চালে লাভ করতে পারেনা। এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় উপার্জনের পরিমান বেশি হয় রেশনের চাল থেকে। দুই ভাবে রেশন চালের জোগান হয় প্রথমত রেশন থেকে প্রাপ্ত চাল। দ্বিতীয়ত রেশনের চাল রঘুনাথ গঞ্জ এবং কাঁটাখালির বাজারে থাকা বড় পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে রেশন ডিলারেরা বিক্রি করে। রেশন ডিলার প্রতি ১ কিলো রেশনের

চাল পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে ৭-৮ টাকায় বিক্রি করে। অপর দিকে পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে চরের বাসিন্দারা প্রতি সপ্তাহে কয়েক কুইন্টাল চাল কিনে যায়। বেশি পরিমাণে কিনলে কিলো প্রতি চাল কম দামে অর্থাৎ ১০ টাকায় কিনতে পারে। পরবর্তী ধাপে জোগাড় করা চাল নদীর ওপারে চরে নিয়ে যায়। ওপার বাংলা থেকে আসা ব্যাপারীরা (আঞ্চলিক ভাষায় ডাকা হয়) প্রতি কিলো চাল ৩০ টাকা দরে কিনে নেয়। কেজি প্রতি তিনগুন লাভ এলাকার বাসিন্দারা পায়। কিছু ক্ষেত্রে ভারতের নিরাপত্তা-রক্ষীরা তিন ভাগের ১ ভাগ লাভের অংশ ঘুষ হিসাবে রেখে দেয়। যদিও চরে চাল নিয়ে যাওয়ার হিসাব প্রত্যেক মানুষ প্রতি ১২-১৫ কেজি নির্ধারিত থাকে। প্রসঙ্গত চরে বর্তমান বসবাসকারী মানুষ ১৫০-২০০ জন। প্রত্যেক পরিবারের প্রধানের একটি করে খাতার ব্যাবস্থা করা আছে। নির্দিষ্ট ঐ খাতায় পরিবারের সদস্য সংখ্যার হিসাব দেওয়া আছে। শুধু মাত্র বি এস এফ নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে হিসাব রাখার জন্য এই খাতার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ওপারে বিক্রি করে দেওয়া হয় একই সিস্টেম এর মধ্যে। যেসকল পন্য সামগ্রী ওপার বাংলাদেশে বিক্রি করা হয় তা হল- চিনি, বিভিন্ন রকমের মসলা, ফেনসিডিল, নেশাজাত দ্রব্য, সিগারেট ইত্যাদি। অঞ্চলের বাসিন্দারা সব ধরণের পণ্যসামগ্রি বিক্রয় করতে পারে এপারের থেকে দুই অথবা তিন গুন দামে। বর্তমান মানুষের তথাকথিত চোরাচালানকারী পেশাকেই জীবিকা করে নিয়েছে। দ্রব্য সামগ্রীর পাশাপাশি চরের মানুষের বেশি পরিমাণে উপার্জনের আরেকটা বড় মাধ্যম হল গরু ও অন্যান্য গবাদি পশু। বর্ষার সময় বাদ দিয়ে বাদবাকি সময়ে নদী পার করে চরে নিয়ে যায়। যার চাহিদা বাংলাদেশে প্রায় সবসময় থাকে। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও চরের বাসিন্দারা সবসময় বিক্রি করতে পারেনা। কারণ বি এস এফ দের বেশি পরিমাণে ঘুষ দেওয়ায় উপার্জনের পরিমান বেশি হয়না। তাই পারাপারের প্রক্রিয়াটি আলাদা। প্রথমত কাঁটাখালির পার থেকে গরু ওপারে চরে নিয়ে যায়। এর পর চরের দীর্ঘদিন রাখে অন্য পারে দাম বেশি হলে বিক্রি করে দেয় সেটাও ব্যাপারীদের(যারা ব্যাবসায় মাধ্যম হিসাবে কাজ করে) মাধ্যম দিয়ে। কার্যকলাপের এই ধরণ সামগ্রিক ভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে হলেও অনেক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন ও হতে হয় অনেক সময়। এলাকার মানুষের সব সময় এই কার্যকলাপ করতে পারেনা- যেমন ভরা বর্ষায় মানুষের মূল ভূমি থেকে পণ্যসামগ্রী নিয়ে যেতে দেওয়া হয়না। যেহেতু বি এস এফ ক্যাম্প থেকে নৌকা ছাড়ার ব্যাবস্থা থাকে তাই নৌকা চলাচলের বিষয়টা নিরাপত্তারক্ষীদের হাতেই থাকে। তাছাড়া এই মরসুমে সপ্তাহে একদিন নৌকা চলে। চরে যাওয়ার জন্য নৌকা ছাড়া অন্য কোন যোগাযোগ মাধ্যম নেই। পাশাপাশি এটাও লক্ষ্য করার বিষয় হল ভোটের সময় সীমান্ত কড়াকড়ি হয়ে ওঠে। প্রয়োজনের বেশি পণ্য-সামগ্রী ওপারে চরে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়না।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমি আমার গবেষণায় ক্ষেত্র-সমীক্ষায় চর অঞ্চলের মানুষের প্রাত্যহিক দৈনন্দিন জীবনের জীবিকা ও অর্থনীতিকে ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। চর অঞ্চলের ভাঙনের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কি ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে সেটি দেখানর চেষ্টা করেছি। চর সীমান্তে বসবাসকারী জনজীবনের জীবিকা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আলোচনায় বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ। একাধারে এলাকার মানুষের জীবিকার সংকট যেমন প্রকট আবার পাশাপাশি বর্তমান সময়ে বসবাসকারী অঞ্চলের বাসিন্দাদের অস্থায়ী উপার্জনের নয়া পন্থা, অন্যদিকে দেখা যায় চর সীমান্তে অবস্থানকারী আন্তর্জাতিক সীমানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরণের অনিশ্চয়তা, সব কিছুই সীমান্তকে ভিন্নতার চরিত্র প্রদান করে। আবার নানাবিধ প্রশ্ন গুলো উঠে আসে এলাকার উন্মুক্ত সীমান্তের অবস্থান, মানুষের কার্যকলাপ, চরের ভাঙন, সীমান্তরক্ষীদের দায়িত্ব বোধ থেকে। চরের বাসিন্দাদের অস্থায়ী জীবিকা নির্ধারণে তগিদ এবং দ্রব্যাদির জোগানে (যেমন রেশনের চাল) যে সকল ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয় তা কি শুধুমাত্র এই সকল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষই কি প্রশ্নের মুখে পড়ে। না স্থানিক রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কার্যকলাপ জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়।

চরবাসীদের ক্ষেত্রে সীমান্ত কেবল এক ভৌগলিক বাসস্তবতা নয়, বরং এক প্রাত্যহিক চর্চা। এখানে তারা প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রের নিয়ম, আইন, নজরদারি এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে লেনদেন করে।[37] তারা নদী পার হয়, চাষাবাদ করে, স্থানীয় চুক্তিতে ভূমি ব্যাবহার করে। সবই এমন এক সীমান্তবাসী অস্তিত্বের অংশ, যা রাষ্ট্রীয় আইনি কাঠামোর বাইরে একটি বাস্তবতা তৈরি করে। এই অধ্যায় দেখায়, কিভাবে চরবাসীরা প্রতিদিনের জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে সীমান্তকে পুনঃ উৎপাদন করে- কখনো তা মান্য করে, আবার কখনো তা অস্বীকার করে। তারা সীমান্তকে শুধুমাত্র এক শাসন্তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন নয়, বরং একটি কৌশলগত সম্পদ হিসাবে ব্যাবহার করে। চোরা পথে পণ্য আনা নেওয়া, প্রশাসনিক কত্রিপক্ষের সাথে সমঝোতা অথবা এড়িয়ে চলা, দুই রকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্বৈত পরিচয় বজায় রাখে।[38] এখানে সীমান্ত একটি দ্বৈত অস্তিত্বের ক্ষেত্র যেখানে একই ব্যাক্তি হয়তো একদিকে ভারতীয় নাগরিক আবার অপর দিকে বাংলাদেশি আত্মীয়ের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ থাকে কিংবা সে কৃষিকাজ

[37] এই অংশে আমি আমার খেত্রসমীক্ষা অঞ্চলে অংশগ্রহণ মুলক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

[38] তদেব।

করে এমন জমিতে, যা আইনি ভাষায় নির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্রের নয়।[39] এই অভিজ্ঞতা গুলো দেখায় দেখায় যে, সীমান্তের সঙ্গে বসবাস মানে কেবল নিষেধ ও নজরদারির মুখমুখি হওয়া নয় বরং সেই শাসন কাঠামোর মধ্যেই টিকে থাকার সৃজনশীলতা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। বর্ডার ধারণাটি তা শুধুমাত্র সীমান্ত সম্পর্কে জানার একটি উপায় নয় বরং রাষ্ট্র, নাগরিকত্ব, ক্ষমতা ও পরিচয় কাঠামো সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করার একটি দৃষ্টিকোণ। চরবাসীর জীবন দেখায়- সীমান্ত কেবল মানচিত্রের টানা রেখা নয়, বরং জীবনের ভেতরে অনবরত সংঘটিত এক রাজনৈতিক অনুশীলন।

তথ্যসূত্র

[1] Alam, Snehashis, and Mohan Kumar Bera. "Flood-Induced Health Vulnerability: A Case Study of Nirmal Char in Murshidabad District, West Bengal." *Disaster Advances* 17, no. 6 (2024): 9-16.

[2] Arnold, Markus, Corinne Duboin, and Judith Misrahi-Barak, eds. *Borders and Ecotones in the Indian Ocean: Cultural and Literary Perspectives*. Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, 2020.

[3] Azad, Abul Kalam. *Maritime Security of Bangladesh: Facing the Challenges of Non-Traditional Threats*. Dhaka: Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, 2009.

[4] Banerjee, Paula. "Bengal Border Revisited." *Journal of Borderlands Studies* 27, no. 1 (2012): 31-44.

[5] Bhardwaj, Sanjay K. "India-Bangladesh Border Governance: Issues and Challenges." *International Studies* 50, nos. 1-2 (2016): 109-129.

[6] Chakraborty, Amrita. "Lines in the Sand(bar): Collective Perspectives and Shifting Temporalities in *Char… The No Man's Island*." *Latin American Literary Review* 48, no. 96 (2021): 101-116.

[7] Chakraborty, Gorky. "The Demographic Question in the Char Areas of Assam." *Social Change and Development* 11, no. 2 (2014): 113-120.

[8] Chakraborty, Gorky. *Roots and Ramifications of a Colonial 'Construct': The Wastelands in Assam*. Kolkata: Institute of Development Studies Kolkata, 2012.

[9] Chatterji, Joya. "The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52." *Modern Asian Studies* 33, no. 1 (1999): 185-242.

[10] Chowdhury, Debdatta. "Lands and Communities in Flux: The Chars in the Ganga-Brahmaputra Deltaic Region." In *Borders and Ecotones in the Indian Ocean: Cultural and Literary Perspectives*, edited by Markus Arnold, Corinne Duboin, and Judith Misrahi-Barak, 151-169. Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, 2020.

[11] Gillan, Michael. "Refugees or Infiltrators? The Bharatiya Janata Party and 'Illegal' Migration from Bangladesh." *Asian Studies Review* 26, no. 1 (2002): 73-95.

[12] Government of Assam. *The Assam Land and Revenue Regulation, 1886 (Regulation I of 1886)*. Shillong: Government of Assam, 1886.

[13] Government of Bengal. *The Alluvion and Diluvion Regulation, 1825 (Bengal Regulation XI of 1825)*. Calcutta: Government Press, 1825.

[14] Government of India and Government of Bangladesh. *Bangladesh-India Land Boundary Agreement*. New Delhi/Dhaka, 1974.

[15] Helen Keller International. *Life in the Chars in Bangladesh: Improving Nutrition and Supporting Livelihoods through Homestead Food Production*. Nutritional Surveillance Project Bulletin No. 14. Dhaka, 2003.

[39] Space and Territoriality: Borderscapes and Borderlanders of the Chars Bikash Sarma1 Abstract International Studies 50(1&2) 92–108 2016 Jawahalal Nehru University SAGE Publications sagepub.in/home.nav DOI: 10.1177/0020881716654386 http://isq.sagepub.com

[16] Jamwal, N. S. "Border Management: Dilemma of Guarding the India-Bangladesh Border." *Strategic Analysis* 28, no. 1 (2004): 5-36.

[17] Kumar, Balram, and Debarshi Das. "Livelihood of the Char Dwellers of Western Assam." *Indian Journal of Human Development* 13, no. 1 (2019): 90-101.

[18] Lahiri-Dutt, Kuntala, and Gopa Samanta. *Dancing with the River: People and Life on the Chars of South Asia*. New Haven and London: Yale University Press, 2013.

[19] Lahiri-Dutt, Kuntala, and Gopa Samanta. "Fleeting Land, Fleeting People: Bangladeshi Women in a Charland Environment in Lower Bengal, India." *Asian and Pacific Migration Journal* 13, no. 4 (2004): 475-496.

[20] Lahiri-Dutt, Kuntala, and Gopa Samanta. "'Like the Drifting Grains of Sand': Vulnerability, Security and Adjustment by Communities in the Charlands of the Damodar River, India." *South Asia: Journal of South Asian Studies* 30, no. 2 (2007): 327-350.

[21] Momin, Hassan, and Gorky Chakraborty. "Measuring Impermanence: A Community Perspective on Char Land." *Ecology, Economy and Society-the INSEE Journal* 6, no. 1 (2023): 123-131.

[22] Nurani, Nur-E-Shahrin, and Md. Masum Abluddalh. "Determinants Associated with Women Empowerment: The Perspectives and Views of Char Area of Bangladesh." *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology* 40, no. 4 (2022): 19-28.

[23] Rahman, Md. Mojahar, and Md. Faruk Shah. "Making and Unmaking of State Boundaries: Ethnographic Evidence from a Bangladesh Border Village." *Perspectives in Social Science* 17 (2021): 65-82.

[24] Rudra, Kalyan. *Shifting of the Ganga and Land Erosion in West Bengal: A Socio-Ecological Viewpoint*. CDEP Occasional Paper 8. Kolkata: Indian Institute of Management Calcutta, 2006.

[25] Sarma, Bikash. "Space and Territoriality: Borderscapes and Borderlanders of the Chars." *International Studies* 50, nos. 1-2 (2016): 92-108.

[26] Schendel, Willem van. *The Bengal Borderland: Beyond State and Nation in South Asia*. London: Anthem Press, 2004.

[27] Sengupta, Anwesha. "Some Stories from the Bengal Borderland: Making and Unmaking of an International Boundary." In *Bengal Borders and Travelling Lives*, edited by Anwesha Sengupta and Himadri Chatterjee, 3-21. Kolkata, 2012.

[28] Sur, Malini. *Jungle Passports: Fences, Mobility, and Citizenship at the Northeast India-Bangladesh Border*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2021.

[29] Sur, Malini. "Time at Its Margins: Cattle Smuggling across the India–Bangladesh Border." *Cultural Anthropology* 35, no. 4 (2020): 546-574.

Cite this article

Majumdar, C. (2025). Charlands at the Border: Livelihoods, Opportunities, and Crisis: সীমান্তে চরঃ জীবিকা, সুযোগ এবং সঙ্কট. *Research Review Journal of Interdisciplinary Studies*, *1*(3), 01-15. https://doi.org/10.31305/rrjis.2025.v1.n3.001